ফেরদাউসে বাড়ি

আব্দুল হালিম শরর

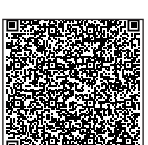

ফেরদাউসে বারিঁ

আব্দুল হালিম শরর

ভাষান্তর
মাসুম বিন শাহাদাত

গ্রন্থিক
প্র কা শ ন

উৎসর্গ

দুই প্রান্তের দুজন মানুষ,
কিন্তু সহৃদয়তার দিক থেকে অনেক কাছাকাছি–
কামরুল হাসান নকীব, পুলিন বকসী

পরীদের দল

এখন হিজরি ৫৬১ সাল; কিন্তু আজ থেকে দেড়-শতাব্দী পূর্বে—মুসাফির বিশেষত হজ-যাত্রীদের জন্য ওই কাঁচা-উঁচুনিচু পথটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক। যে পথটি 'বাহরে খিজির'-এর দক্ষিণ উপকূল থেকে শুরু হয়েছে, তারপর বাবেল শহর হয়ে (ফেরদৌসীর) শাহনামায় বর্ণিত প্রাচীন দেওয়াস্তান; অর্থাৎ মুলকে মাজিনদারান, এলাকায়ে রুদবার ঘুরে, তালেকানের পাহাড়ের দক্ষিণ-উত্তর পার্শ্ব পার হয়ে কাজভিন অতিক্রম করে গেছে।

দীর্ঘদিন ধরে এই পথের অবস্থা এমন বেহাল যে, দিনে-দুপুরে বড়ো বড়ো কাফেলা লুট হয়ে যায়; নিরপরাধ মানুষের লাশ ঠাণ্ডায় জমে বরফের মতো বছরের পর বছর ধরে চলে আসা জুলুম-হত্যা ও লুণ্ঠনের নিদর্শন হয়ে পড়ে থাকে।

এই দিনগুলো হয় শীতের শুরুতে—যখন বিগত বছরের বরফ এখনো পূর্ণ গলে শেষ হয়নি, নতুন বরফ পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এখনো তা এ পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, বসন্তের নিদর্শন দেখা গেছে বা ফসলের আকাঙ্ক্ষা একেবারে উবে গেছে; বরং মৌসুমের শেষ কিছু ফুল এখনো আছে। তাই কখনো কখনো দেখা যায় তার গুণমুগ্ধ প্রেমিক বদখশানের বুলবুলিকে; যে তার সুর লহরীতে হাজারো ঘটনা, হাজারো হৃদয়মথিত গান শুনায়।

এটা আরবের শুকনো ঘাসহীন রোদজ্বলা নগ্ন পাহাড় নয়; বরং চারিদিক সবুজ গাছপালা, ঘন ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-প্রেমিদের জন্য যা অবাক-বিস্ময়কর এক স্থান, একান্ত অভিসারের জায়গা।

যেখানে ঘন গাছপালা, নীল আকাশের ছায়া, সবুজ ঘাসের মখমলি বিছানা। তার ওপর বসে কেউ যদি সিরাজের মাতাল সৌন্দর্য-সুখ নিতে চায়, নিতে পারে। কারণ এখানে এসে নদী থেমে যায়নি; বরং বীরাঞ্জার নদীটি এখানে বিদ্যমান। সম্ভবত এখনো দেড়-শতাব্দী হয়নি এক স্বচ্ছ জলধারা হয়ে পাহাড়ের ভেতরের বিভিন্ন গমনপথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে খরমাবাদের কাছে 'বাহরে খিজিরে' এসে মিশে গেছে।

এসব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি এই পাহাড়ের সাথে সম্পৃক্ত নানা কাল্পনিক ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। কেউ কেউ কল্পনা করে, জান্নাত এ সমস্ত গমনপথে আছে। আবার কেউ কেউ ধারণা করে নেয়, কেনো মারাশ, রুস্তম, নিরিমান পাহলোয়ান প্রাচীন দেও-দানবকে আপন বাজুর শক্তিতে বিনাশ করেছিল। কিন্তু তাদেরই কলঙ্ক হয়ে এখনো অনেক পরী এসব নির্জন স্থানে বাস করে। সুধারণা পোষণকারীদের অনেকেই নাকি এসব পরীকে উড়তে দেখেছে। আর কতক মুসাফির তো এসব পরীদের বড়ো বড়ো দলের হুঁশ উড়িয়ে দেওয়া কণ্ঠ শুনে চোখ উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কথিত আছে — কেউ যদি একাকি এমন নির্জন স্থানে পরীদের কাছে আসে সে তখনই মারা যায়।

কিন্তু এসব পরীদের থেকেও অধিক জালেম হলো বাতেনি[১], মুলাহিদা[২] তরিকার দুজন লোক, যারা ওই এলাকায় বসত করে

১. মুসলমানদের কতিপয় ফেরকা (দল)। যারা আব্বাসি খেলাফতের আমলে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাদের কার্যক্রম ছিল রাজনৈতিক, যদিও তারা ধর্মীয় পোশাক পরেছিল। তাদের মধ্যে একটা ফিরকা ছিল, 'ইসমাইলিয়া'। তাদের পথপ্রদর্শক হাসান বিন সাবা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দখল করার জন্য ১০৯ হিজরি সনে একটি ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ দল গঠন করে। আল বরজ পাহাড়ের (ইরানের একটি পাহাড়)-এর 'মৃত্যু' নামক দুর্গে তাদের আস্তানা গেড়ে তোলে। সেখান থেকে নিজেদের ফিদায়ী: আত্ম-উৎসর্গকারীদের দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে হত্যা ও লুণ্ঠনের মহড়া চালায়।

২. 'মুলাহিদা', 'মুলাহিদ'-এর বহুবচন; অর্থ: বেদ্বিন লোক। উদ্দেশ্য: বাতেনিপন্থি লোক।

প্রভাব বিস্তার করে আছে। সুন্নি আকিদায় বিশ্বাসী কোনো মুসলমান যদি তাদের হাতে পড়ে যায় সে কোনোমতেও প্রাণে বাঁচে না। বিশেষ করে জমাদাল উলা, জমাদাল উখার ও রজব মাসে তাদের জুলুম অত্যাচার বেড়ে যায়। যার কারণ তুর্কিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা; উসতুরাখানের মুসলমানগণ যখন হজে যায়, তখন তারা জাহাজে করে 'বাহরে খিজির' পার হয়ে প্রথমে এই এলাকায় অবতরণ করে; তারপর তালেকানের পাহাড়ের পথ সংক্ষিপ্ত করে ইরাকে চলে যায়। অতঃপর হিজাজের পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার ইচ্ছা করে।

যেহেতু জুলুমের এই সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তাই অধিকাংশ লোক এ পথে চলাচল করা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু অবুঝ-আবেগী মুসলমান ভুল করে এ পথে চলে আসে। তাছাড়া আমুল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য তো এ ছাড়া অন্য কোনো পথও নেই! আলোচিত রাস্তাটি বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র রাস্তার সে দিকটায় নিবদ্ধ, যে দিকটা বীরাঞ্জা নদীর কিনার দিয়ে চলে গেছে। এখানে এসে রুদবার এলাকার সমভূমির শেষ। এরপর থেকে শুধু দুর্গম পাহাড়ি উঁচুনিচু ভূমি। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সড়কটি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে; তারপর আল-বরজ পাহাড়ের নদীর মোহনায় পাঁক খেয়ে অন্য ভূখণ্ডের দুর্গম ঘাঁটিগুলোতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সম্ভবত সন্ধ্যার কিছু সময় এখনো বাকি; সূর্য মলিন, তুষার শৃঙ্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সূর্যের দুর্বল কিরণ যা তখনো হালকা আঁচ দিচ্ছিল, মিটে গেছে। কিন্তু বাতাসের ঠাণ্ডা দোল যা ছড়িয়ে পড়ে উঁচু তুষারপাতের মতো তা মানুষের হাড় কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট।

এমত-অবস্থায় সেখানে উত্তর দিক থেকে আপাদমস্তক ঢাকা দুজন মুসাফির দুটো বোঁচকা নিয়ে ধীর পায়ে আসছে। দুজনে দুটো কমজোর ছোট গাধার পিঠে সওয়ার। তাদের মন্থর চলার ভঙ্গি, জড়োসড়ো ভাব

দেখে মনে হয়, এরা কোনো পার্শ্ববর্তী গ্রামের মোল্লা-মৌলভি-ফকির, যারা রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রপদধারী কোনো সম্পর্কের সাথে জড়িত নয়; বরং দ্বীনি পবিত্র কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে সফরে বেড়িয়েছে। কিন্তু যখন নিকটে আসল তখন দেখা গেল—না, এরা কোনো মোল্লা-মৌলভি-মাশায়েখ নয়; বরং দুজনেই শরিফ কোনো খান্দানের নওজোয়ান। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তাদের দুজনের মধ্যে একজন পুরুষ, আরেকজন নারী। তাদের পোশাক-আশাক, বাহ্যিক অবস্থা-সুরত কোনো কিছু প্রকাশ না করলেও, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় বিষয় লক্ষ্যণীয়—যার কারণে অনায়াসে বলা যায় তারা কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের চোখের মণি। এটা অসম্ভব যে তারা কোনো শরিফ খান্দানের সাথে জড়িত নয়। তা এজন্য যে তারা মোটা মোটা কম্বলের নিচে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছিল, এবং সম্ভ্রান্তের পোশাক পরেছিল।

পুরুষ ছেলেটি যে একজন সুশ্রী যুবক, ওলের কাফতানের ওপর বড়ো পশমি পোশাক পরেছে। মাথার ওপর লম্বা তুর্কি টুপি: যা বাঁশের আঁশ দিয়ে তৈরি শঙ্কুর মতো বকরির কালো চামড়া দিয়ে মোড়া। টুপির ওপর পাগড়ি, পাগড়ির কয়েকটি প্যাঁচ মাথা থেকে নেমে কান ও গলায় জড়িয়ে আছে। পায়ে পশমি পাজামা ও মোজা পরিহিত। কোমরে চামড়ার বেল্ট; যাতে খঞ্জর ও তরবারি ঝুলে আছে। যুবকের কাছে তীর-ধনুক-তূণীরও আছে। প্রাচীন যুগের এই সমস্ত জরুরি হাতিয়ার গাধার জিনে বাঁধা। এ অবশ্য-প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যা দিয়ে সাহসী যুবকটি কোনো শিকার বধ করে, তা নিজে ও নিজ সঙ্গী প্রেমিকার জীবনের অভয় দেয়।

মোটকথা, এক গাধার পিঠে তো এই নওজোয়ান সওয়ার; অপর গাধার পিঠে আঠারো-উনিশ বছর বয়সি তন্বী-তরুণী। মোটা পুরু কাপড় ও বেডপ চামড়ার পোশাকে তার হৃদয়-কাড়া সৌন্দর্য অনেকটা ঢাকা

পড়ে গিয়েছে। কিন্তু সুপ্ত বাসনার একটি সুখ কোথাও লুকিয়ে আছে। যতটা মুখ খোলা তা থেকে যেন সৌন্দর্যের আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। দর্শনকারী তার প্রথম সুনজরেই একিন করে ফেলবে যে—এমন সুন্দরী তরুণীকে কখনো আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

আমাদের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে আসা তরুণীটি হলুদ রেশমি পাজামা পরেছে। যা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঢিলেঢালা; পায়ের গোঁড়ালিতে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা। গলায় লাল জরি দেওয়া রেশমের কোরতা, মাথার ওপর নীলফুল দিয়ে তৈরি আতলুসের খিমার। কিন্তু এ সমস্ত কাপড় ভারী চামড়ার পোশাকের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। যে জিনিসটা তাকে সাধারণত নারী হিসাবে প্রকাশ করছে তা হলো, তার ছোট ছোট কোটি কোটি চুলের গোছা। খিমারের ভেতর থেকে যা পিঠের এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে ইতস্তত ছুটাছুটি করছে। অসম রাস্তা অথবা গাধার দ্রুত চলনে বারবার তা খুলে যাচ্ছিল।

এই সুন্দরী তরুণীর রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা করা মুশকিল। এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কামুক হৃদয় ও ব্যাকুল দৃষ্টির জন্য তার তপস্বী-চেহারার সামান্য রেখাচিত্র তৈরি করে। গোল-গাল উজ্জ্বল মুখ, যা সাধারণত পাহাড়ি জাতিদের মধ্যে হয়ে থাকে। সতী-সাধ্বী এবং আকর্ষণীয়া। লাল আভাযুক্ত কপোল, লাবণ্যময় ডাগর ডাগর শরাবি চোখ, প্রলম্বিত সুন্দর চোখের পাতা; উঁচু, কিন্তু হালকা ছড়ানো নাক, বাঁকা ঠোঁট; কিছুটা পাতলা এলানো ধাঁধাযুক্ত অধর; সুন্দর সাঁচে গড়া ছোট চিবুক। লাজুক প্রকৃতির, সাধারণ দৃষ্টি অবনত, উদ্ধত অস্থির চোখ ও ভ্রু। সৌন্দর্যের এমন সাধারণ উপকরণ ছাড়াও শুধুমাত্র তার অস্বাভাবিক দেহসৌষ্ঠব যে কাউকে অস্থির বে-কারার করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। এই যুবক-যুবতী মুসাফিরদ্বয় চারিদিকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবলোকন করছে এবং স্থানীয় দুর্ভেদ্যতার ভয়ে পথ চলছে।

দিনের শেষ মূহুর্তে চলে আসার শঙ্কায় তাদের চেহারার এমন সকরুণ দশা যে, যেকোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও তা দেখে পেরেশান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হঠাৎ তরুণী তীব্র ইচ্ছার কাছে কাবু হয়ে ঠাণ্ডা শ্বাস নেয়; তারপর চুপিসারে জিজ্ঞেস করে, — 'আজ কী বার?'

যুবক আস্তে-ধীরে হিসাব করে বলে, — 'জুমাবার।'

তরুণী বিষণ্ণ হয়ে বলে, — 'আমরা ঘর ছেড়েছি পুরো আট দিন হলো'। একটু চিন্তা করে আবার বলে, — খোদা তায়ালাই ভালো জানেন, লোকেরা কে কী বলাবলি করছে, কী কী ধারণা পোষণ করছে!

— 'কী আর বলবে, বলবে — হজের ইচ্ছা আমাদের দেশ ছাড়িয়েছে।

অতঃপর তরুণী আরেকটা ঠাণ্ডা শ্বাস নেয়; বলে — 'আমাকে এই অপবাদও দিবে যে, গাইরে মাহরামের সাথে চলে এসেছে!'

যুবক বলে — 'জুমরদ শোন, আমি আর এখন তোমার গাইরে মাহরাম নই; দু-চার দিনের মধ্যেই আমরা কাজভিন পৌঁছে যাব। সেখানে পৌঁছালে আমাদের নিকাহ হবে।'

ফের ঠাণ্ডা শ্বাস নিয়ে জুমরদ বলে — 'খোদা তায়ালাই ভালো জানেন, সেখানে পৌঁছার সৌভাগ্য হবে কি-না! রাস্তার দুর্ভেদ্যতা তো সকলেরই জানা। কোনো সৌভাগ্যবান মুসাফিরই হবেন যিনি পরীদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছেন। আর পরীদের থেকে বেঁচে ফিরলেও কী লাভ? মুলাহিদা কি তাকে ছেঁড়ে দিবে!'

জুমরদের মধ্যে এখন সামান্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; স্থানটি তাকে বিশেষ কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে। যার কারণে সে চারিদিকে ঘুরেফিরে সতর্ক দৃষ্টি ফেলছে; বারবার ঠাণ্ডা শ্বাসও নিচ্ছে। যুবকের

এই বিষয়টির খেয়ালই ছিল না, সে লঘু উচ্চারণে বলে — 'মুলাহিদা থেকে তো আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ আমি তাদের প্রধান নেতা সিজদাতুল্লাহর একটি চিঠি পেয়েছি। যা আমাদের বিশেষ সুরক্ষা দিবে। তা দিয়ে আমরা কারামতিদের জুলুমের হাত থেকে রেহায় পাব!' এসব কথা বলতে বলতেই তারা এমন এক স্থানে এসে পৌঁছায়, যেখান থেকে পথ পার্বত্য অঞ্চলের উঁচুতে উঠে গেছে; নদী পৃথক হয়ে দুর্গম পাহাড়ি গিরিপথ ও ঘন কাঁটাযুক্ত ঝোঁপ-ঝাড়ে ঢুকে ডানদিকে মোড় নিয়েছে।

রাস্তার দিকে যুবক নিজ গাধাটিকে বাড়াবে, এমন সময় জুমরদ গাধার লাগাম টেনে দাঁড়ায়। বলে — 'না, হোসেন।'

হোসেন পেরেশান হয়ে জুমরদের দিকে তাকায়, বলে — 'তাহলে কোন দিক দিয়ে যাবে?'

— 'যেদিক দিয়ে নদী বয়ে গেছে।'

— 'সেদিকে তো পথ নেই ?'

— 'আগে গিয়ে তো দেখবে!'

— 'তুমি কি আসলেই কাজভিন যাবে নাকি তোমার এরাদা অন্যকিছু?'

— 'হ্যাঁ, আমার মূল গন্তব্য কাজভিন নয়; আমার তো দেখার সাধ নদী কোথায় কোথায় বয়ে গেছে!'

— 'সেদিকে তো পরীদের নির্জন স্থান!'

— 'তাতে কি? থাকতে দাও!'

— 'শুনেছি কেউ সেখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরতে পারে না!'

— 'এটা আমিও চাই।'

হোসেন হতবাক হয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে — 'তাহলে তোমার হজের নিয়্যতের কী হবে?'

— 'হ্যাঁ, তা ঠিক আছে। কিন্তু আগে ভাই মুসার কবরে গিয়ে ফাতেহা শরিফ পড়ি, তারপর মক্কা মুয়াজ্জমার নিয়্যত করা যাবে।

— 'কী বলছ, তোমার ভাইয়ের কবর! কিন্তু এটা কোথায় আছে কে জানে?'

— 'আমার জানা আছে, রাস্তাও চিনি, সেই স্থানটিও।'

হোসেন বিস্মিত হয়, বলে — 'তুমি কী-ই-বা জানো?'

— 'আমি খু-উ-ব জানি!'

— 'সেখানে কি কখনো গিয়েছিলে?'

— 'না। কিন্তু ইয়াকুব, যে মুসা ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে এসেছিল, তার কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়েছি। প্রথম আলামত তো এটাই যেখান থেকে নদী আলাদা হয়ে গেছে, তারপর রাস্তা ছেড়ে নদীর কিনারায় যেতে হবে। বাকিটা সামনে গিয়ে বলছি।

— 'ইয়াকুব কী জানে! কে-ই-বা বলতে পারে পাহাড়ের এই খাঁজে খাঁজে কে কখন কীভাবে মারা গেছে?'

— 'তুমি জানো না; মুসা ভাই, ইয়াকুব দুজনে এক সাথে ছিল। এখানে আসার পর তারা নদীর কিনারা দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়, তারপর আল বরজ পাহাড় পার হয়ে পরীদের আস্তানায় এসে নামে। ভাই তো পরীদের হাতে মারা পড়ে; ইয়াকুব তখন মূর্ছা যায়। দ্বিতীয় দিন হুঁশ ফিরলে সেখানে ভাইয়ের লাশ পড়ে থাকতে দেখে। সে তখন ভাইকে দাফন করে, তারপর কবর বানিয়ে একটি পাথরে ভাইয়ের নাম খোদাই করে চলে আসে।'

— 'আমার কাছে তো এটা বানোয়াট কিস্সা বলে মনে হয়। সেদিক থেকে দেখলে ইয়াকুবকে পরীরা জীবিত ছেড়ে দিল, আর শুধু তোমার ভাই-ই মরে গেল?'

— 'তার কারণ হলো ভাই এক পরীর হাত ধরেছিল, ইয়াকুব ছিল বোঁকা, ও পরীদের দেখেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়।'

— 'তাহলে তো এমন স্থানে কখনোই যাওয়া উচিত নয়!'

— 'না, হোসেন। আমি অবশ্যই সেখানে যাব।'

— 'খোদা তায়ালা না করুক, আমরা সেখানে পৌঁছলাম আর আমাদের সামনে পরীরা নামল তখন কী হবে?'

— 'আমি তাদের ভয় পাই না, তুমি ভয় পেলে যেও না!'

— 'তুমি একা যাবে, আর আমি যাব না তা কীভাবে সম্ভব! আমি তো তোমার ভালোবাসায় জীবনও দিতে পারি।'

— 'শোন হোসেন, আমি তোমার সাথে এখানে আসতাম না, জানি তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে। আমি সেই সময় থেকেই তোমাকে চিনি যখন আমরা একসাথে মক্তবে পড়তাম। আমি তোমাকে ভালেবাসি। কিন্তু এটা মনো করো না তুমি একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে প্ররোচিত করে এখানে নিয়ে এসেছ। আমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি। শুধু এই আশায় ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন দেব। যখন এই ইচ্ছে পূরণ হবে, তখন হজে যাব।'

— 'না জুমরদ, না। নিজ জীবন-যৌবন ও স্বল্প বয়সি হওয়ার প্রতি করুণা করো। এই ইচ্ছে পরিত্যাগ করো।'

— 'না, এ হতে পারে না। এই ইচ্ছার কারণেই আমি বেইজ্জত হয়েছি।'

হোসেন হতাশ হয়ে বলে — 'হে খোদা, যদি জীবনই না বাঁচল, আমি মরে যাই!'

জুমরদ হেসে ফেলে বলে — 'তোমার চোখে কিন্তু বিপদের আভাস পাওয়া যায় না, ভয়ের ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। আমাদের আন্তরিক চেষ্টা আমাদের টেনে নিয়ে যাবে। যদি মরে যাই দুজনে একসাথে মরব।' এটা বলে জুমরদ নিজ গাধাটাকে বীরাঞ্জা নদীর পথে ঘুরায়।

দুই কদম চলেছে এমন সময় হোসেন চলার গতি শ্লথ করে দিয়ে বলে — 'থামো জুমরদ। একটু ধৈর্য ধরো। যেতে চাইলে কালকেও যাওয়া যাবে। এখন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, পৌঁছতে পৌঁছতে গভীর রাত হয়ে যাবে।'

— 'না, এখনি চলো। এখানে কোথাও কোনো জনবসতি পাওয়ার আশা নেই। যদি জঙ্গলেই অবস্থান করতে হয়, তাহলে এখানে আর ওখানে থাকা সমান কথা।' হোসেন তার কথা ফেলতে পারল না, তখনই দাঁড়িয়ে গেল। পূর্বাপর চিন্তা করতে করতে আল বরজ পাহাড়ের অন্ধকার গমনপথের সঙ্গমস্থলে ঢুকে পড়ল। দুজনে আস্তে-ধীরে চলতে থাকে। সুনসান নীরব স্থানের ভয় তাদের অন্তরে এমনভাবে ছেয়ে গেল যে — দুজনের কোনো সাড়া-শব্দটি নেই, একদম চুপ! যতই আগে বাড়তে থাকে বন-জঙ্গল তত ঘন থেকে ঘনতর হয়। সময়ে সময়ে ঠাণ্ডাও বাড়তে থাকে। নিশ্ছিদ্র নীরবতা নদীর প্রবহমান শব্দকে বাড়িয়ে তোলে। যার কারণে সেই ভীতিকর স্থানের ভয়ে গা কাঁটা দেয় । এখানে এসে রাস্তা দুর্গম হয়ে পড়েছে, তাই গাধা থেকে নামতে হলো। আগে পিছে করে দুজনে নিজ গাধাকে ডান হাতে ধরে পাথরের নিচ দিয়ে জঙ্গলের ভেতরে চলতে শুরু করে। দীর্ঘ নীরবতার পর হোসেন ভীত হয়ে বলে — 'নিশ্চয় পরীরা এমন নির্জন স্থানে বাস করে। মানুষ কী, এখানে তো কোনো জন-প্রাণীরও দেখা নেই!'